Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-II, October 2019, Page No. 38-43
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রামনারায়ণ তর্করত্ন: অনূদিত বাংলা নাটক

বন্দনা সিন্‌হা মহাপাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The influence of medieval translation is seen in Bengali literature which later contributed to Bengali drama literature as well. In the nineteenth century, the way of Bengal drama began to be translated into English and Sanskrit literature. At the time of writing this translation play many dramatists came forward. Among them Ramnarayan Tarkaratna had taken a permanent seat in the Bengali drama. He translated Srihattas Ratnabali drama by the name Ratnabali. Also his other translated play's are Benisonhar, Avigyan Shakuntalam, Malatimadhab etc. These play's are not only literally translation of Ramnarayan Tarkaratna, they are sufficiently original and have an identity of writer's mind. Which I will try to discuss in detail in the article 'Ramnarayan Tarkaratna : translated drama.

মূল প্রবন্ধ: অসামান্য নাট্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তিনিই প্রথম কলকাতার নাগরিক সমাজে অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে মাইকেল মধুসূদন দত্তও অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পন্ডিত, কবি ও নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন ভট্টাচার্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে চব্বিশ পরগণার হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে অনেক দিন অধ্যয়ন করে তর্করত্ন উপাধিতে ভূষিত হন। বাংলা ভাষায় নানা গ্রন্থ রচনা করলেও সংস্কৃত ভাষায় ছিল তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য। তিনি মৌলিক নাটক, অনুবাদ নাটক এবং প্রহসন লিখে 'নাটকে রামনারায়ণ' নামে আখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর অনূদিত নাটকগুলি হল (ক) বেণীসংহার (১৮৫৬), (খ) রত্নাবলী (১৮৫৮), (গ) অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৬০), (ঘ) মালতীমাধব (১৮৬৭)।

'রত্নাবলী' নাটকটি শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী'র অনুবাদ। তবে অবিকল অনুবাদ নয়। মূল নাটকের ন্যায় অনুবাদও চার অঙ্কে বিভক্ত। 'রত্নাবলী'র কাহিনীটি এই রকম- বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে নিজ কন্যা রত্নাবলীর বিয়ে দেবার জন্য সিংহলরাজ তাকে মন্ত্রীসহ প্রেরণ করেন। পথে ঝড় বৃষ্টিতে নৌকাডুবি হলে বৎসরাজের মন্ত্রী রত্নাবলীকে উদ্ধার করে এবং তার পরিচয় জানতে পেরে এই কন্যারত্নকে রাজমহিষী বাসবদত্তার কাছে লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু উদয়ন হলেন প্রেমিকপ্রবর; তিনি যথাকালে রত্নাবলীর খোঁজ জানতে পারলেন। বাসবদত্তার কাছে এই সংবাদ গোপন থাকল না। তিনি রত্নাবলীকে অপরিসীম যন্ত্রণা দিলেন। এদিকে সিংহল রাজার মন্ত্রী বৎসদেশে উপনীত হয়ে রত্নাবলীর পরিচয় সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন। তখন রাণী বাসবদত্তাই স্বামীর সঙ্গে রত্নাবলীর বিবাহ দিলেন। সে যুগের বহুবিবাহ অধ্যুষিত বঙ্গীয় অভিজাত সমাজের কাছে বড় মনোরম কাহিনী এটি।

এই নাটকটির অনুবাদে রামনারায়ণ এর সংহত রূপের দিকেও নজর দিয়েছেন। রত্নাবলী মূল নাটকে চারটি অঙ্ক আছে; প্রস্তাবনা ছাড়া একটি বিষ্কম্ভক, একটি প্রবেশক ও বারোটি দৃশ্য নিয়ে এই নাটক গঠিত। রামনারায়ণ অঙ্ক সংখ্যা কমাননি। তবে দৃশ্য সংখ্যা কমিয়ে আট করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে দৃশ্যান্তর ছিল ঘন ঘন আসলে তা

ছিল একই দৃশ্যের একটু অবস্থান্তর। রামনারায়ণের রত্নাবলীর এই সংহত অঙ্ক ও দৃশ্যের জন্যই জনৈক অনুবাদক বলেছেন- "ইহার নাটকীয় সংস্থানগুলি ও ঘটনার পাকচক্র কতকটা আধুনিক নাটকের ন্যায় সেইজন্য এখনকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী।"

ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকটি কিছুটা পরিবর্তন করে রামনারায়ণ চলিত ভাষায় নাটকটি রচনা করেছেন। 'বেণীসংহারে' দ্রৌপদীর কেশবন্ধনে ভীমের ভূমিকাই প্রধান। বীররসাত্মক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকটি প্রচন্ড গতিসম্পন্ন। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের পূর্বে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশ ধরে সভাকক্ষে আনা থেকেই এই কাহিনীর শুরু। তারপর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস, পান্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে ভীমের দুঃশাসনকে পরাজিত করে তার বুকের রক্ত পান, যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমকর্তৃক দুর্যোধনের প্রহার, দ্রৌপদীর বেণীসংহার- এইসব ঘটনার ঘনঘটাতেই নাটকটি শেষ হয়েছে।

'বেণীসংহার' নাটকটি রামনারায়ণের প্রথম অনুবাদ নাটক। মূল 'বেণীসংহারের' গঠন পরিকল্পনার সঙ্গে অনুবাদের গঠন পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা করলে রামনারায়ণের মঞ্চ সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নাটকটি ছয়টি অঙ্ক বিশিষ্ট। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য ছিল। নাট্যকার সব কয়টি দৃশ্য জোড়া দিয়ে একটি দৃশ্য তৈরী করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে একটি বিষ্কম্ভক ছিল; সেটি পরিত্যক্ত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে মূল নাটকে রাক্ষস-রাক্ষসী দিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা বোঝাবার জন্য একটি প্রবেশক ছিল। লেখক সেই প্রবেশক অংশটির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন অশ্বত্থামা কৃপাচার্যের কথোপকথন অংশ। চতুর্থ অঙ্কেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রথমে বর্ণিত হয়েছিল প্রহারমূর্ছিত দুর্যোধনকে নিয়ে সারথীর প্রবেশ। রামনারায়ণ এই অংশটি বর্জন করেননি; স্থান পরিবর্তন করেছেন। ফলে ঘটনার শোকাবহতা বেড়েছে। সর্বাপেক্ষা বড় পরিবর্তন হল মঞ্চে ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান। তিনি বর্ণনা করেছেন- 'ভূতলে পাতন' ও নানারূপে বধ পূর্বক তাহার বক্ষঃস্থলের রক্তপান করিয়া অট্টহাস্য নৃত্য।

পঞ্চম অঙ্কে ইউরোপীয় নাট্যশাস্ত্র অনুসারে ঘটেছে- document- এর মতই। মূল নাটকের পঞ্চম অঙ্ক থেকে যুধিষ্টির দ্রৌপদী প্রসঙ্গ নিয়েছেন। ষষ্ঠ অঙ্কে ভীম কর্তৃক দ্রৌপদীর বেণীসংহারে নাটকের অবসান ঘটল। কিন্তু রামনারায়ণ সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র অনুসারে শান্তি বচনে নাটকের শেষ ঘটালেন।

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' কালিদাসের প্রসিদ্ধ নাটকের স্বাধীন অনুবাদ। এই নাটকের কাহিনীতে পাই-মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বের হয়ে কন্বমুনির আশ্রমে এসে উপনীত হলেন। সেখানে শকুন্তলার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। শকুন্তলা কন্বমুনির পালিতা কন্যা। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। কিন্তু জন্মের পরই সে পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। সে কন্বমুনির আশ্রমে প্রতিপালিতা হন। মহারাজ দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। যাত্রার পূর্বে অভিজ্ঞান স্বরূপ একটি অঙ্গুরীয় শকুন্তলাকে দিয়ে যান। এদিকে পতি বিরহ কাতর আশ্রমে আগত দুর্বাসাকে পরিচর্যা করতে ভুলে গেল; ফলে অভিশাপগ্রস্ত হলো।

কন্বমুনি আশ্রমে ফিরে এসে শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী জানতে পারলেন। গর্ভবতী শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করা সমীচীন মনে করে শাঙ্গরব ও শারদ্বত নামক শিষ্যদ্বয় ও ভগিনী গৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলাকে পতিগৃহ অভিমুখে পাঠালেন। ইতিমধ্যে শকুন্তলা দুষ্মন্ত প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি হারিয়ে ফেলেছেন। আর দুর্বাসার অভিশাপে রাজাও শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না। মাতা মেনকা সহসা এসে আবির্ভূত হয়ে তাকে ঋষি মরীচীর আশ্রমে নিয়ে যান; সেখানে শকুন্তলা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। এই পুত্রই ভরত।

এদিকে রাজা দুষ্মন্তের হাতে শকুন্তলার হারানো আংটি এসে পৌছাল; রাজার তখন সব কিছু মনে পড়ল। রাজা দুষ্মন্ত ইন্দ্রের আহ্বানে স্বর্গে অসুর নিধনে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে মরীচির আশ্রমে শকুন্তলার দেখা পেলেন এবং সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন ঘটল। রামনারায়ণ কালিদাসের কাহিনীর খোলসটুকু নিয়েছেন মাত্র।

এই নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেছেন- "অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগি করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে রসভাবাদি পরিবর্তিত, পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত হয়েছে।"

'মালতীমাধব' ভবভূতির নাটকের অনুবাদ। এখানেও মূল নাটকের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়েছে। এই নাটকের কাহিনী অধিক পরিচিত নয়। নাটকের কাহিনীটি এইরকম- বিদর্ভদেশের রাজার দুই মন্ত্রী ভুরিবসু ও দেবরাত। তাঁরা পরস্পরের পুত্র কন্যার মধ্যে বিবাহবন্ধন প্রতিষ্ঠা করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। মালতী হলেন ভুরিবসুর কন্যা, আর মাধব হলেন দেবরাতের পুত্র। পরিব্রাজিকা কামন্দকীর উদ্যোগে উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটে এবং প্রেম সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রাজা বাধ সাধলেন। তাঁর আদেশে মালতীর সঙ্গে আর এক পাত্রের বিবাহের আয়োজন হতে থাকে। মালতী আর কি করবেন? গৃহ ত্যাগ করাই সমীচীন মনে করেন। কিন্তু সেখানেও বিপদ এল। অঘোরঘন্ট নামক এক কাপলিক তাকে ধরে শ্মশানে নিয়ে চলল। কিন্তু মাধব এসে পড়লেন। কাপালিকাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে মালতীকে উদ্ধার করলেন। কামন্দকীর আশ্রমে মালতী ও মাধবের বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হয়। কিন্তু নিহত কাপালিক শিষ্যা কপালকুন্ডলা মালতীকে অপহরণ করে পলায়ণ করে। এক্ষেত্রেও মালতী আবার উদ্ধার পেল। কামন্দকীর জনৈকা শিষ্যা মালতীকে কপালকুন্ডলার কবল থেকে উদ্ধার করে মাধবের নিকট প্রেরণ করলেন। উভয়ের মধ্যে মিলন সম্পূর্ণ হল।

'মালতীমাধব' নাটকটি দশ অঙ্ক বিশিষ্ট একটি মহানাটক। এই নাটকেও তিনি বহু পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেছেন। দশ অঙ্কের এই নাটকটিতে সেই যুগের মঞ্চের দাবী অনুসারে পঞ্চমাঙ্কে রূপান্তরিত করেছেন। মূলের বহু ঘটনা সংক্ষেপিত হয়েছে। কোন ঘটনা স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে বা পরিত্যক্ত হয়েছে। দৃশ্যগুলি পরিবর্তিত হয়েছে, এবং তাদের সংখ্যা বহু হ্রাস পেয়েছে। দশ অঙ্কের এই নাটকটি উনিশটি দৃশ্য ও চারটি বিষ্কম্ভক নিয়ে গঠিত ছিল। রামনারায়ণ পাঁচ অঙ্কে ও এগারটি দৃশ্যে তাকে রূপান্তরিত করেছেন। এ রূপান্তর ছিল বাঞ্ছনীয় রূপান্তর।

ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের নান্দী, সূত্রধার, নটী বর্জন করা হয়েছে এবং নাটকটিতে একটি গানও নেই। কিন্তু এর দু'বছর পর ১৮৮৫ রামনারায়ণ শ্রীহর্ষর নাটিকা অবলম্বনে যে 'রত্নাবলী' নাটক লিখলেন, তাতে নান্দী ছলে গান, নটীর বসন্ত বর্ণনা গান এবং দশটি গান রয়েছে। গানগুলি নাট্যকার নিজে রচনা করেননি। গানগুলি রচনা করেছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী- একথা নাটকের 'বিজ্ঞাপনে' রামনারায়ণ নিজেই বলেছেন। নাটকে ১২টি গানের এই সংযোজন প্রসঙ্গে রামনারায়ণ বিজ্ঞাপন অংশে জানালেন—

> *"এই নাটকাভিনয় বিষয়ে যে অনেকেরই ঔৎসুক্য জান্মিয়াছে তাহা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত থাকল এ গ্রন্থ তদুপযোগীকরণ মানসে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি এবং তন্নিমিত্ত শ্রীগুরুদয়াল চৌধুরী মহোদয় দ্বারা কতিপয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া স্থান বিশেষে যোজনা করা গিয়াছে। যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে। তথাপি এককালে সঙ্গীত মাত্র উচ্ছেদ কোরা অভিমত কখনোই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সঙ্গীত সম্পদ নিতান্ত পরিবর্জিত হইলেও তাহাতে রস ও সৌন্দর্য হানির সম্ভাবনা। বোধকরি পাঠকমন্ডলীও এ অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবেন না।"*[১]

মূল 'রত্নাবলী' নাটকের শ্লোকগুলি অনুবাদ না করে তার পরিবর্তে নাটকের মাঝে মাঝে যে গান সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলি চেটি, চৈতালিক এবং সিংহল রাজকুমারী সাগরিকার (রত্নাবলী) গান, গানগুলি প্রেম বিষয়ক টপ্পা ধরনের। গানের প্রকাশভঙ্গী উন্নত এবং ভাষা মার্জিত। তবে ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য গুরুদয়ালের রচনা বলে অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি। নমুনা স্বরূপ সাগরিকার একটি গান উদ্ধৃত করছি—

(ভৈরবী-আড়া)
"শুন রতিপতি করিছে তোমায়ে এই মিনতি।
এ রীতি কি রীতি তব হইয়ে ভূপতি।

আনন্দে হইয়ে কত রঙ্গ কর মনোমত
বধিতে যুবতী,
হর কোপানলে জ্বলে গেল না কুমতি
তব শরে নিরন্তর জর জর চরাচর
অমর প্রভৃতি
সে শর সন্ধান কেন অবলার প্রতি।"[২]

রামনারায়ণ তর্করত্ন সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারদের মতো অবিকল অনুবাদ করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর অনুবাদকৃত বেশীরভাগ নাটকেই নিজস্বতা পরিলক্ষিত করা গেছে। আবার অনুবাদকৃত নাটকগুলির মধ্যে নানাভাবে সংস্কৃত রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রামনারায়ণ দেশীয় ভাষার প্রতি অনুরক্ত হবেন এটাই স্বাভাবিক। চারটি সংস্কৃত নাটক অনুবাদের ক্ষেত্রেই তাঁর সংস্কৃতানুরাগী মন ও মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হলেও ইংরেজি ভাষায় খুব বেশী আধিপত্য ছিল না। তবে একথা ঠিক তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারার অধিকারী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও বহমান ছিল। তিনি তখন অসামান্য সংস্কৃত নাটক লিখেছিলেন। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় রামনারায়ণ তর্করত্নের অস্থি-মজ্জাগত ভাবেই সংস্কৃত ভাবনার দ্বারা আবৃত ছিলেন। সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে অঙ্কবিভাগ থাকলেও দৃশ্যবিভাগ ছিলনা। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন নাটক রচনার ক্ষেত্রে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ উভয়কেই বর্তমান রেখেছেন।

ভবভূতির সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে রচিত রামনারায়ণের মালতিমাধব (১৮৬৭) মঞ্চ সাফল্য লাভ করেছিল। এই নাটকে নানাভাবে গান ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য গানগুলি রামনারায়ণের নিজের রচনা নয়- গানগুলি রচনা করেছিলেন বনয়ারিলাল রায় নামে এক সাঙ্গিতজ্ঞ। একথা নাট্যকার ভূমিকাতেই উল্লেখ্য করেছেন। এই নাটকের নান্দি, সূত্রধার, নটী কিছুই নেই এবং ভবভূতির নাটকটি তিনি নতুন করে লিখেছেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদকৃত নাটকের ক্ষেত্রেও গান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিভিন্ন নাটকগুলিতে গানের যে প্রাধান্য বর্তমান সেক্ষেত্রে নাট্যকার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সমকালীন দর্শককে আনন্দদানের জন্য নাট্যকার গানের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমকালীন দর্শকবৃন্দ গানের প্রতি যে গানের বাড়তি আকর্ষণ বোধ করবেন, এটা রামনারায়ণের ভাবনার মধ্যেই ছিল। নাট্যকার স্বাভাবিকভাবেই অনুবাদ ও মৌলিক উভয় প্রকার নাটকের মধ্যেই গানের ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। গানগুলি সে যুগের দর্শকদের দিকে চেয়েই লেখা হয়েছে। ১ম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে উজ্জয়িনীর অধীশ্বরের প্রধানমন্ত্রী ভুরিবসুর কন্যা মালতির দাসী মন্দারিকার একটি গান—

(খাম্বাজ - খেমতা)
"গেল প্রাণ রে সজনী, তাঁ সঁপে মন ধন।
পরের বেদনা পরেতো জানে না,
তবু বুঝে না আমার মন।
ছিল যে বাসনা সফল হল না
শুধু হতে হল জ্বালাতন।"[৩]

গানটিতে ইঙ্গিত রয়েছে। বিদর্ভ দেশাধিপতির মন্ত্রী দেবরাতের পুত্র মাধব এসেছেন সখা মকরন্দকে নিয়ে। উজ্জয়িনীতে মালতী ভালবেসে ফেলেছে মাধবকে, ইঙ্গিতে সেই কথাই বলা হয়েছে।

রূপমুগ্ধা মালতী সখী লবঙ্গিকাকে পাঠিয়েছে মাধবের কাছে। তার ফিরতে দেরী হচ্ছে। তাই উৎকণ্ঠিতা মালতী তার হৃদয় দুয়ার খুলে দিয়েছে গানে-

(শঙ্করাভরণ - আড়া)
"হায় কি লাগি হল মন নয়ণের অধীন
এ কেমন ব্যাবহার ।
জান তো যেমন আঁখির গুণ
আমার হইয়ে নহে আমার।
হয়ে মম ধন কেনরে মন
ভুলিলে তুমিও কুহকে তার,
নয়ণ কারণে ভাব যে ধনে
সে কি এ ভাবের ভাবি তোমার
আঁখির যন্ত্রণা বুঝে বোঝেনা
দিওনা যাতনা, সহে না আর।"[৪]

মালতীর হৃদয় বেদনাই প্রকাশ করা হয়েছে এই গানের মাধ্যমে। এই একটি নয়, আরও গানের মাধ্যমে মালতী এইভাবে তার হৃদয় বেদনা প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে মাধবের মনের কথা প্রকাশ করা হয়েছে নেপথ্য সঙ্গীতের সাহায্যে। যেমন—

(সাহানা - আরা)
"কি সুখের দিন, সব সাধ পূরিবে
মন আজি সুখ-সাগরে ভাসিবে।
সব সখীগণ মিলি গাহ সুমঙ্গল
এতদিনে বিধি অনুকুল হইবে জুড়াবে নয়ণ।"[৫]

মালতী ও মাধবের মিলনদৃশ্যে মালতী যে গানটি গেয়েছে, সেটি অধিমিশ্র আনন্দের সঙ্গীত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু গানটিতে সে যুগের ভারতীয় নারীর অসহায় অবস্থার ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে। মালতী গাইছে—

(খাম্বাজ - মধমান)
"দেখো ভুলো না এ দাসীরে
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিন তরে।
তোমা বিনে অন্য আর কি ধন আছে আমার
প্রাণে মরি ও বদন ক্ষণ না হেরিলে পরে
কুলশীল লাজ ভয়, পরিহরি সমুদয়
সঁপেছি জন্মের মত প্রাণ মন তব করে।"[৬]

এছাড়া মালতীমাধব নাটকে বৈজ্ঞানিকের একটি গান আছে এবং নাটকের শেষ দৃশ্যে যবনিকা পতনের আগে আছে একটি 'মাঙ্গলীক গীত'।

নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর অনুবাদকৃত 'মালতীমাধব' নাটকের মধ্যদিয়ে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন প্রণয়কথা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রতিফলন গঠিয়েছেন এই অনুবাদকৃত নাটকটির মধ্যদিয়ে। মধ্যযুগীয় নারী পুরুষের হৃদয়ের প্রেম-ভালবাসা, আরতি-বেদনার নানান ছবি নাট্যকার অনেকাংশেই নিজস্বতার পরিচয় রেখেছেন। আধুনিক সময়কালের নারী পুরুষের প্রেম ভালবাসারও নানান দিক গানের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই নাটকের গানগুলির মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র প্রাচীনযুগই নয় আমাদের মনে হয়েছে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের হৃদয়ের অসয়তা প্রকাশিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবেই ভারতীয় মানব সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নাট্যকার দিতে

সাহায্য করেছেন। যা আগামীদিনে নারী সম্পর্কে আমাদের মনে মর্যাদা ও সম্মানের আসন পেতে সাহায্য করেছে। নারীদের প্রতি আমাদের সহৃদয় শ্রদ্ধা-ভালবাসার স্থান ক্রমশ বেড়েছে।

শুধুমাত্র গানই নয় সংলাপ ও চরিত্র চিত্রণের দিক থেকেও নাট্যকার অনুবাদকৃত নাটকে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর অনুবাদকৃত অনেক নাটকের ক্ষেত্রেই সংস্কৃত নাটকের কাহিনীকে কোথাও অবিকল রেখে, কোথাও আবার আংশিক সংশোধন ও বিয়োজনের মধ্যদিয়ে নাট্যকার তাঁর নিজস্বতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। বাক্যের ব্যাবহার, সংস্কৃত শ্লোক, প্রকৃতির নানান বর্ণনা সমস্ত কিছুই সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হলেও ঘতনা, আঙ্গিক ও চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে সমকালীন সমাজের প্রভাবে তিনি প্রভান্বিত হয়েছেন। যা সমকালীন অন্যান্য অনুবাদক নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন স্বতন্ত্র জায়গা অর্জন করেছিলেন।

প্রত্যেক নাট্যকারই চান তাঁর নাটক অভিনীত হোক এবং সাফল্য লাভ করুক। সেজন্য কোন নাট্যকার সমকালীন সমাজের মানুষের রুচি ও চাহিদাকে নাটকের মধ্যে উপেক্ষা করতে পারেন না। যে জীবনসমস্যা মানুষের জীবনকে বাস্তবক্ষেত্রে আলোড়িত করে, তার একটি রসরূপায়ণ মানুষকে দেখাতে চান অনুবাদক রামনারায়ণ তর্করত্ন। সেই জীবনসমস্যার প্রকাশ, তার বিচিত্রতা ও সমাধানের ইঙ্গিত মানুষ জানতে আগ্রহী। সেজন্য মানুষ তার সমস্যাক্ষুব্ধ জীবনের রূপ দেখতে প্রেক্ষাগৃহে যায়। ব্যক্তিগত জীবনের কোন জটিল প্রশ্ন যখন অভিনয়ের মাধ্যমে এক রসলোকের বস্তু হয়ে ওঠে ও প্রেক্ষাগৃহের বহু দর্শকের চিত্তের মধ্যে যখন আলোড়ন জাগায় তখন ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন সত্য ও সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বাংলা মৌলিক নাটকের উদ্ভব হলেও , তরুণ বাঙালি শিক্ষিত সমাজের মনে দীর্ঘকাল ধরেই অনুবাদ এবং মৌলিক নাটক লেখার সুপ্ত বাসনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে এই অনুবাদ কর্মে অনেকেই নিজেকে নিয়োজিত করলেও শেরার শিরোপার দাবীদার নিঃসন্দেহে দিতে হয় রামনারায়ণ তর্করত্নকেই। অনুবাদ কাজে তিনি শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যকেই আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করেননি, নব্যশিক্ষিত যুবক হওয়ায় তাঁর অনূদিত নাটকের মধ্যে পাশ্চাত্য নাটকের নানা বৈশিষ্ট্যও সংস্কৃত কাহিনীর আশ্রয়ে চিত্রিত হয়েছে। 'রামনারায়ণ তর্করত্ন: অনূদিত বাংলা নাটক' প্রবন্ধটির আলচনায় দেখলাম, রামনারায়ণ তর্করত্ন কাহিনী নির্বাচনে মৌলিকতা দেখাতে পারেননি। তবে একথা বলতেই হবে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যে কাহিনী তিনি নিয়েছেন, তা তাঁর শৈল্পিকগুণে আক্ষরিক অনুবাদের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক জায়গাতেই মৌলিকতার দাবী রাখে। পরবর্তীকালে তাঁরই অনুপ্রেরণায় অনেক নাট্যকারই বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। সন্ধ্যা বকসী সম্পাদিত, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ-৩৮৭ ।
২। সন্ধ্যা বকসী সম্পাদিত, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ-৩৯৭।
৩। সন্ধ্যা বকসী সম্পাদিত, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ-৫২০।
৪। সন্ধ্যা বকসী সম্পাদিত, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ-৫২৩।
৫। সন্ধ্যা বকসী সম্পাদিত, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ-৫৫০।
৬। সন্ধ্যা বকসী সম্পাদিত, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ-৫৫৮।